কালের কণ্ঠ

তারিখ ১2 NOV 2017
পৃ: ... কলাম ...

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী ▷

শিক্ষার মানোন্নয়ন জরুরি

প্রযুক্তির নানা ব্যবহারের সুযোগ থাকায় কিছু কিছু শিক্ষার্থী তুলনামূলকভাবে ভালো করলেও বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই পঠনপাঠনের অভ্যাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে, ছেলেরা পিছিয়ে পড়ছে। বিভিন্ন নিয়োগ বোর্ডে এখন ব্যাপকসংখ্যক প্রার্থীর অংশগ্রহণ দেখি। তাদের প্রায় সবাই তদবির-সংস্কৃতিতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। তবে সেই তুলনায় বিষয়জ্ঞানে তাদের পিছিয়ে পড়ার লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে। এখানেও মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে মেয়েদের নিয়োগ হয়তো একচেটিয়াই হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে মেয়েদেরই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের দায়িত্ব নিতে হতে পারে

দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় লেখাপড়ার চর্চা ক্রমেই কমে আসছে। শিক্ষাব্যবস্থার গুরুদায়িত্ব যে শিক্ষকসমাজের ওপর ন্যস্ত, তাঁদেরই শিক্ষাজীবন তেমন কৃতিত্বের বলে দাবি করতে পারেন না। শিক্ষকতাকে মহৎ পেশা হিসেবে নিয়েছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। অথচ একসময় শিক্ষকতা পেশায় যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেকের প্রাতিষ্ঠানিক িক্ষা কম থাকলেও শিক্ষকতাকে তাঁরা মহৎ পেশা সেবেই বেছে নিয়েছিলেন। সততা, নিষ্ঠা, জানার াগ্রহ তাঁদের ভালো শিক্ষক হিসেবে সমাজে পরিচিতি ত। অথচ বেশির ভাগ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলেই াবনধারণের মতো বেতন-ভাতা তাঁরা তখন পেতেন । স্কুলপর্যায়ের শিক্ষকদের অনেকেই লজিং থেকে লতেন, অবস্থাপন্ন বা সচ্ছল পরিবারের শিক্ষকরা ড়িতে থেকে শিক্ষকতা করলেও পেশার প্রতি তাঁদের ল বিশেষ নিষ্ঠা ও আকর্ষণ। সেই তুলনায় এখন ক্ষকদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধাকে খারাপ বলা বে না; কিন্তু তার পরও প্রত্যাশিত লেখাপড়া স্কুলে চ্ছ না, কলেজগুলোতে নিয়মিত ক্লাস প্রায় হয় না, শ্ববিদ্যালয়ে তারতম্যভেদে লেখাপড়া চললেও গনোভাবেই তা প্রত্যাশিত মানের বলা যাবে না।

গটি কোটি ছেলে-মেয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে না পরীক্ষার সনদপত্র নিয়ে বের হলেও লেখাপড়া নে, শিখে বা দক্ষতা অর্জন করে শিক্ষাজীবনে ইতি নছে—এমন শিক্ষার্থীর হার খুব একটা উল্লেখ করার তো নয়। বলা চলে, ৫ থেকে ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী াপ্ত ডিগ্রির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা বা দক্ষতা নিয়ে র হয়। তাদের একটি বড় অংশই প্রতিযোগিতামূলক রীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অথবা বেসরকারি উচ্চ বেতনের করিতে যুক্ত হয়, কেউ কেউ বিদেশেও চলে যাচ্ছে। কি শিক্ষার্থীদের বড় অংশই চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ারে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সৌভাগ্যবশত চাকরি পেলে জীবন তাদের ধন্য বলে ধরে নেয়। তবে দীর্ঘদিন থেকেই এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনিম্ন প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগে নানা দুর্নীতি-অনিয়ম রাজত্ব করে আসছে। দেশে ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষার ৩৮ হাজার স্কুল সরকারি করা হলেও শিক্ষক নিয়োগে সরকারি নিয়ম-নীতি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। থানা-উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অনেকটা ইচ্ছামতোই শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারতেন। ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারলে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়া মোটেও কষ্টকর ছিল না।

সম্ভবত ১৯৮৮ সালের দিকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তন করে। শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা অতি সম্প্রতি সর্বনিম্ন এইচএসসি উত্তীর্ণ বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মান কেমন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর মধ্যে কোটা প্রথায় ৬০ শতাংশ নারী ও অন্যান্য কোটায় নিয়োগের বিধান থাকায় নারী শিক্ষকের সংখ্যা স্কুলে কয়েক গুণ বেড়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবও এসব নিয়োগে অস্বীকার করার উপায় নেই; যদিও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা সরকারিভাবে নেওয়া হয়। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি স্পষ্ট। নিয়োগপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষকের বাংলা, ইংরেজি, গণিত বা বাংলাদেশ বিষয়ের জ্ঞান-দক্ষতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। বস্তুত বেশির ভাগ নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিষয়গত দক্ষতা প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করা কিংবা তাদের মধ্যে লেখাপড়ায় আগ্রহী করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং বেশির ভাগ শিক্ষকই শিশুদের স্কুলমুখী কিংবা লেখাপড়ামুখী করার দক্ষতা রাখেন না। ফলে গ্রাম বা শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্কুলবিমুখ হয়ে পড়ে, পড়ালেখায় ভীষণভাবে অনাগ্রহী থাকে, শুদ্ধভাবে বই পড়তে বা পাঠ লিখতে শেখে না। এ ধরনের শিক্ষার্থী গ্রামাঞ্চলে বেড়েই চলেছে।

শিক্ষকদের অনেকেই ঘর-সংসারের বাইরে লেখাপড়ায় মোটেও সময় দেন না। অথচ গ্রামাঞ্চলে ২০-২৫ হাজার টাকা বেতন পেয়ে শিক্ষকদের সন্তুষ্ট থাকার কথা, লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করা দরকার। বেশির ভাগ শিক্ষকই বই-পুস্তক, এমনকি পত্রপত্রিকাও নিয়মিত পড়েন না। ফলে তাঁদের মধ্যেই লেখাপড়ার অভ্যাস না গড়ে উঠলে শিক্ষকতা পেশাকে তাঁরা কিভাবে আত্মস্থ করবেন, তা সহজেই অনুমেয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব যাঁদের ওপর পড়েছে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের জ্ঞান-দক্ষতায় সচেতন নন, শিক্ষার্থীদের তাঁদের পক্ষে গড়ে তোলা মোটেও সহজ নয়। শিক্ষকদের কার্যক্রম তদারকির জন্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারাও সততার পরিচয়দানে খুব বেশি দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন না। শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলায় তাঁদের বাড়তি উপার্জনের সুযোগ ঘটে। আবার কোনো কোনো শিক্ষা কর্মকর্তার আচরণ ও দুর্নীতির কারণে শিক্ষকদের নৈতিকতায় ধস নামতে সাহায্য করে।

স্কুল পরিচালনা কমিটির বেশির ভাগই স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তারা অনেক সময় স্কুলকে দেওয়া সরকারি অর্থে ভাগ বসাতে সচেষ্ট থাকে। তাদের নিজেদেরই লেখাপড়ার দৌড় শূন্যের কোঠায়। ফলে কমিটি অযাচিত হস্তক্ষেপ করতেই বেশি ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের নানা ধরনের বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে সরকার ব্যস্ত রাখে, তাতে শিক্ষকরা মূল দায়িত্ব না পালনের অজুহাত পান কিংবা তাঁদের হাতে সময় থাকে না। এমনিতেই স্কুলে নিয়মিত পাঠদানে, মানসম্মত পাঠদানে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে—তার ওপর উপবৃত্তি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহে শিক্ষকদের ব্যস্ত রাখা মোটেও ঠিক হচ্ছে না। সরকার এমনিতেই ২৬ হাজার বেসরকারি স্কুল সরকারি করেছে, যেগুলোতে আগে নিয়োগপ্রাপ্ত বেশির ভাগ শিক্ষকই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা পূরণ করছেন না কিংবা করলেও প্রশিক্ষণের অভাবে পাঠদানে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারছেন না। সরকারি স্কুলগুলোতেও রয়েছে যোগ্য শিক্ষকের অভাব। সব মিলিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে। এ কারণে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, একই সঙ্গে শ্রেণিপাঠ চালিয়ে যাওয়ার মতো চলনসই শিক্ষার্থীও আশানুরূপ নয়। এর পরও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেক শিক্ষার্থীই মাধ্যমিক স্কুলের বই-পুস্তক আত্মস্থ করতে পারছে না। এখন গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত কেজি স্কুলের প্রসার ঘটছে, সেগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে বাহ্যিক যে চাকচিক্য দেখানো হচ্ছে, তাতেও মানের সমস্যা দূর হচ্ছে না। অধিকন্তু এখন রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এসব কেজি স্কুলের প্রসার ঘটিয়ে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ না করে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেশির ভাগই বেসরকারি। এগুলোতে এত দিন শিক্ষক নিয়োগে পরিচালনা পর্ষদই চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করত। এর ফলে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসাগুলোতে অযোগ্য ও অদক্ষ শিক্ষকই বেশি নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই পরিচালনা পর্ষদকে অর্থ দিয়ে চাকরি নিয়েছেন, শিক্ষা অধিদপ্তরকে ঘুষ দিয়ে এমপিও বাগিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের বিষয়গত শিক্ষার মানও অত্যন্ত নিম্নমানের। শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে এসেও তেমন ভিশনারি-মিশনারি শিক্ষকের পাঠদানের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত হতে পারছে না। অধিকন্তু শিক্ষকরা অর্থকড়ির বিনিময়ে গাইড বই কিনতে শিক্ষার্থীদের প্ররোচিত করেন, ব্যাচে বা কোচিংয়ে ছাত্র পড়ান না এমন শিক্ষকের সংখ্যা হাতে গোনা যাবে। আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই বাংলা, ইংরেজি, গণিতে বেশ দুর্বল। তাদের এসব বিষয়ের দুর্বলতা কাটানোর মতো দক্ষ শিক্ষকের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষার্থীই চলতি মানের নিচে লেখাপড়া নিয়ে ক্লাস ডিঙালেও এসএসসি উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়াদের অর্ধেকেরও কম। বাকি শিক্ষার্থীরা পরিবারের জন্য দুঃখের কারণ হয়ে পড়ে, অনেকেই বখাটে হিসেবে নাম লেখায়। কিছুটা স্বস্তির জায়গা হচ্ছে ছাত্রীদের নিয়ে। তারা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। তবে গ্রামের বেশির ভাগ মেয়েই সামাজিকতার কারণে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে আমাদের কলেজ শিক্ষা এখন অনেকটাই মানহীন হয়ে পড়েছে। সেখানেও শ্রেণিপাঠ, মানসম্মত পঠনপাঠনের অভাব, বই-পুস্তক পড়ার সংস্কৃতিহীন পরিবেশ, ছাত্রসংগঠনের প্রভাবে পড়ে উঠতি ছেলেদের অনেকেই নিয়মিত পঠনপাঠন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বই-পুস্তকের সঙ্গে আরো কম সম্পর্কে শিক্ষার্জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে একটি বড় অংশের শিক্ষার্থী। পরীক্ষায় তাতে তেমন প্রভাব পড়ে না। সেটির ব্যবস্থা হয়ে যায়। কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অনিয়ম, দুর্নীতি, পঠনপাঠনের বাধ্যবাধকতাহীন অবস্থা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যে শিক্ষা সনদ পায়, তা তাদের খুব একটা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে না। তারা দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি, এমনকি প্রথম শ্রেণি নিয়ে বের হয়েও একটি প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় খুব একটা কৃতকার্য হতে পারে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তদবির ও ঘুষ লেনদেন করেই কিছু একটা জোগাতে হয়।

অন্যদিকে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাণিজ্যই মুখ্য। সে কারণে এক বছরে তিন সেমিস্টার দেখিয়ে অর্থ উপার্জনের সহজ রাস্তা করেছেন এর প্রতিষ্ঠাতারা। বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী অভিজ্ঞ কোনো শিক্ষক নেই। ছাত্র-ছাত্রীরাও এসব নিয়ে খুব একটা সোচ্চার নয়। তাদের বেশির ভাগই সনদ পেলেই তুষ্ট, পড়াশোনা করতে আগ্রহী নয়। দেশের কলেজগুলোতেও এখন লাখ লাখ শিক্ষার্থী স্নাতক সম্মান ও মাস্টার্স প্রগ্রামে ভর্তি হয়; কিন্তু ক্লাস করে না, বইয়ের নামও জানে না, শিক্ষকের নামও জানে না। কিন্তু সনদ অর্জনে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনো কিছুটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে এগুলোতেও মেধাবী, যোগ্য শিক্ষকের ব্যাপক অভাব রয়েছে। ফলে প্রত্যাশিত মানের শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। তারাও প্রকৃত মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। ইদানীং প্রযুক্তির নানা ব্যবহারের সুযোগ থাকায় কিছু কিছু শিক্ষার্থী তুলনামূলকভাবে ভালো করলেও বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই পঠনপাঠনের অভ্যাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে, ছেলেরা পিছিয়ে পড়ছে। বিভিন্ন নিয়োগ বোর্ডে এখন ব্যাপকসংখ্যক প্রার্থীর অংশগ্রহণ দেখি। তাদের প্রায় সবাই তদবির-সংস্কৃতিতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। তবে সেই তুলনায় বিষয়জ্ঞানে তাদের পিছিয়ে পড়ার লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে। এখানেও মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে মেয়েদের নিয়োগ হয়তো একচেটিয়াই হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে মেয়েদেরই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। ছেলেদের পিছিয়ে পড়াকে আমি মেধার বিনাশ হিসেবে দেখে শঙ্কিত হচ্ছি। আমি চাই, ছেলে-মেয়ে সবাই নিজেদের মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাবে, সর্বত্র মেধাবীরাই নেতৃত্ব দেবে। তবে তা লেখাপড়াহীন শিক্ষাব্যবস্থায় বাড়বে কিভাবে?

লেখক : অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Patwari54@yahoo.com.